



সম্পাদকীয়

অদ্ভুত এক সময়ের মধ্যে দিয়ে চলেছি আমরা। তামাম বিশ্বের সমগ্র মানব জাতি আজ হতচকিত এবং সন্ত্রস্ত। অতিমারি বা মহামারি, ডাক্তারি ভাষায় যাই বলা হোক, সারা পৃথিবী জুড়ে তাণ্ডব লীলা চালাচ্ছে। আতঙ্ক আর সংকট মিলেমিশে অঙ্কটা বড়ই জটিল। চিকিৎসক, নার্স, বিজ্ঞানী, বিবিধ চিকিৎসাকর্মী, জনসেবায় নিযুক্ত বিভিন্ন পেশার মানুষ ও সাধারণ মানুষের অক্লান্ত পরিশ্রম ও আশ্রয় চেষ্টা সত্ত্বেও আশু কোনও সমাধানের হৃদিস মিলছে না। এক অতি ক্ষুদ্র জীবাণু, নিতান্তই একটি ভাইরাস, যার নাম দেওয়া হয়েছে করোনা, এই বিশ্বব্যাপী সমস্যার কারণ। এর ভয়ংকর প্রকোপের হাত থেকে খানিকটা রেহাই পাওয়ার একটা উপায় হল নিজেকে যথাসম্ভব গৃহবন্দি করে সামাজিক ভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকা। এতে সংক্রমণের হার এবং সম্ভাবনা কমবে। সারা পৃথিবীর সমস্ত দেশ আর সেখানকার সব মানুষই কমবেশি এই নিয়ম মেনে চলছে। তবে জনসংখ্যা, জনসংখ্যার ঘনত্ব, অর্থনৈতিক অবস্থা, লোকজনের মানসিক গঠন ইত্যাদির উপর নির্ভর করে কিছু ক্রটিবিচ্যুতি ঘটলেও মোটামুটি ভাবে সবাই যতটা সম্ভব নিজেকে ঘরবন্দি করেছেই রেখেছেন। এছাড়াও আরও কিছু নিয়ম মানতে হচ্ছে যেমন বারবার সাবান দিয়ে হাত ধোয়া, মুখোশ পরা ইত্যাদি। খুব দরকার ছাড়া প্রায় কেউই বেরোচ্ছেন না। কাজকর্ম, গল্প আড্ডা, এর-তার বাড়ি যাওয়া, বেড়াতে যাওয়া, বাইরে খাওয়া, স্কুল কলেজ সব বন্ধ। অনেকে অবশ্য “ঘর থেকে কাজ কর”-এর আওতায় পড়ে এই সময়েও বেশ চাপের মধ্যে রয়েছেন। তবে যা হচ্ছে সবই বাড়িতে থেকে। জীবনযাত্রা বেশ কিছুটা সরল হয়ে গেছে, পরিবারের সঙ্গে সময় কাটানো, বাড়ির কাজ সবাই মিলে ভাগ করে নেওয়া, বাইরের খাবার বন্ধ, এমন কী অনেক পুরুষই দেড়মাথা চুল নিয়ে বেশ একটা অনারকম রূপ ধারণ করেছে।

এর ফাঁকে বেশ কিছু নতুন নতুন শব্দের আমদানি ঘটেছে। কোয়ারান্টাইন, লক ডাউন, প্লেগ, হার্ড ইমিউনিটি এ রকম অনেক কিছু। আমরা জেনে গেছি প্লেগ জাতীয় একটা সমস্যার অভ্যুত্থান ঘটেছে। প্লেগ শব্দটা অনেক সময় চলতি অর্থে মহামারি বা ঐ জাতীয় ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হলেও আসলে এটা এক বিশেষ ধরনের রোগ। বিশেষ ব্যাক্টেরিয়া জনিত এই রোগের প্রকোপ খুব অল্প সময়ের মধ্যে

একটি অঞ্চলে অনেককে আক্রান্ত করে। করোনা প্লেগ নয়। ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যায়, পৃথিবীতে প্রথম মহামারি ঘটেছিল প্রায় ১২০০ খ্রিষ্ট পূর্বাব্দে, ব্যাবিলন, মধ্য এশিয়া, মেসোপটেমিয়া ও দক্ষিণ এশিয়া ইত্যাদি অঞ্চলে। ভারতীয় পণ্ডিত ও ঐতিহাসিকরা অনুমান করেন যে এটি ছিল ইনফ্লুয়েঞ্জা জাতীয় জ্বর তবে কতজনের প্রাণহানি ঘটেছিল সে বিষয়ে সঠিক তথ্য পাওয়া যায় না। এরপর খ্রিষ্ট পূর্ব ৪-এর শতকে বার দুয়েক গ্রিস দেশে প্লেগের উৎপাত দেখা গিয়েছিল যদিও মৃত্যুর হার খুব বেশি নয়। এর পরেরবার ৫০ লক্ষ থেকে ১ কোটি লোকের প্রাণহানি ঘটেছিল রোমান সাম্রাজ্যে ১৬৫ থেকে ১৮০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে। রোম সম্রাট আন্তোনিয়াস-এর আমলেই এই প্লেগ দেখা দিয়েছিল বলেই এ রকম নাম। এর পরে সবচেয়ে ভয়ানক প্লেগের যে ঘটনা আমরা জানতে পারি তা হল বিউবনিক প্লেগ। বিউবনিক কথার অর্থ হল লসিকাগ্রন্থির প্রদাহ (inflammation of lymph nodes) জনিত সমস্যা। ষষ্ঠ খ্রিস্টাব্দের মাঝামাঝি থেকে শুরু হয়ে ঘুরেফিরে একটানা অষ্টম শতকের গোড়ার দিক পর্যন্ত এর প্রাদুর্ভাব দেখা গিয়েছিল। প্রথম ধাক্কাতেই প্রাণহানি ঘটেছিল কমবেশি ১০ কোটি লোকের। বলা হয় যে তৎকালীন ইউরোপের জনসংখ্যার অর্ধেক এই প্লেগে মারা যায়। ইউরোপ ছাড়াও পশ্চিম এশিয়াতেও এর প্রকোপ ছিল ভয়াবহ। এই বিউবনিক প্লেগ বারবার ফিরে ফিরে এসেছে পৃথিবীর বুকে। ১৮ শতকের মাঝামাঝি থেকে ১৯ শতকের মাঝামাঝি অবধি সারা পৃথিবীতে দাপিয়ে বেড়িয়েছে এই মহামারি। শুধুমাত্র চীন ও ভারতেই মৃত্যু হয়েছিল প্রায় এক কোটি কুড়ি লক্ষেরও বেশি মানুষের। পরেও মাঝেমাঝেই ঘুরে এসেছে এই মহামারি কোনও না কোনও দেশে। এমন কী এই সেদিন, অর্থাৎ ২০১৪ থেকে ২০১৭ সাল অবধি আফ্রিকার মাদাগাস্কারে বিউবনিক প্লেগের প্রকোপ দেখা গিয়েছিল যদিও মৃত্যু হয়েছিল প্রায় ৩০০ জনের। এছাড়াও, বসন্ত, কলেরা, হাম, ইনফ্লুয়েঞ্জা, ডেঙ্গি, ইবোলা ইত্যাদি বিভিন্ন রকমের জীবাণুবাহিত রোগের ফলে মহামারি আমাদের পৃথিবীতে অনবরত লেগেই ছিল। কখনও কোয়ারান্টাইন পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে। ১৩৫০ থেকে কমবেশি দশ বছরে ইউরোপের জনসংখ্যার প্রায় ৩০ শতাংশ মানুষ মারা যায় “ব্ল্যাক ডেথ” এর প্রকোপে। ইতালীয় ভাষায় চল্লিশ দিন বোঝাতে যে শব্দ ব্যবহৃত হয় সেখান থেকেই এই কোয়ারান্টাইন শব্দের উৎপত্তি। এ যাবৎ যত মহামারি দেখা দিয়েছে তার অধিকাংশই জীবাণু ঘটিত।

সম্পাদকীয়

(১ম পৃষ্ঠার পর)

এই জীবাণুনাশের ওষুধ বলতে বেশিরভাগই হল ভ্যাকসিন অর্থাৎ টিকাকরণ। যাতে এই রোগ না হয়। তবে টিকাও আজ অবধি খুব কম জীবাণুরই বেরিয়েছে। আরেকটা পদ্ধতিতে এই মহামারির হাত থেকে মানুষ রক্ষা পায়। সেটি হল হার্ড ইমিউনিটি (Herd Immunity)। এর অর্থ হল, কোনও একটা নতুন জীবাণুর সঙ্গে লড়াই করার মতো অস্ত্র মানুষের শরীরে থাকে না কিন্তু যত বেশি মানুষ সংক্রমিত হয় তত ধীরে ধীরে মানুষের মধ্যে স্বাভাবিক শারীরিক নিয়মে একটা প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরি হয়। তবে সবাইকেই যে সংক্রমিত হতে হবে তা নয়, এই জীবাণুর সাহচর্যে আসার ফলেই (exposure to the virus) এই প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরি হয়। আবার, এমনও দেখা যায় যে হয়ত অনেকেই সংক্রমিত হয়েছে কিন্তু কোনও উপসর্গ বা সমস্যা দেখা দেয়নি অর্থাৎ রোগটা প্রকট হয়নি। যেমন, টিবি-র জীবাণু সর্বত্র বিরাজমান আর আমরা প্রত্যেকেই এই জীবাণুর সংস্পর্শে রয়েছি কিন্তু সবারই কি টিবি হচ্ছে? আবার কারও কারও দেহে টিবি-র জীবাণু পাওয়া গেলেও সে কিন্তু টিবি রোগী নয়। এইভাবেই কিছুদিনের মধ্যে এখনকার এই করোনা ভাইরাসের সঙ্গে যুঝে একে সঙ্গে নিয়েই আমরা আবার স্বাভাবিক জীবনযাপনে ফিরে যাব। হয়ত কিছু নতুন নিয়ম নতুন অভ্যাস আমাদের রপ্ত করে নিতে হবে। তবে জীবন তার ছন্দে ফিরবেই। কাজকর্ম, লেখাপড়া, স্কুল কলেজ অফিস আদালত সব আগের মতোই চলবে। অ্যালামিনর অফিস আবার রবিবার সকালে ও বুধবার সন্ধ্যায় খোলা হবে। প্রাক্তনীর আবার আসাযাওয়া শুরু করবে।

মাঝে কিছুদিন এই দুঃসময় চলছে, হয়ত আরও কিছুদিন চলবে। এই দুর্দিনে করোনায় আক্রান্ত হয়ে অথবা অন্য কোনও রোগে কয়েকজন প্রাক্তনী আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন। কেউ কেউ বড় অসময় চলে গেলেন। তাদের পরিবারের সদস্যদের প্রতি আমাদের সহানুভূতি ও প্রয়োজনে আমাদের সাধ্যমতো তাদের পাশে দাঁড়ানোর অঙ্গীকার নিয়ে ভারাক্রান্ত হৃদয়ে আমরা সবাই এই দুঃসময়ের দ্রুত অবসানের জন্য প্রার্থনা করি।

বর্তমানে অন্যান্য অনেক কিছুর মতোই ডাক ব্যবস্থাও সচল নয়। ফলে, গত মার্চ মাসের প্রকাশিত খেয়া পোস্ট করা সত্ত্বেও প্রায় কেউই পান নি। এপ্রিল মাসে পুরোপুরি লকডাউন ছিল, এ মাসেও একই অবস্থা। আমরা সেই কারণে এখন খেয়ার একটা অনলাইন সংখ্যা প্রকাশ করলাম। ই-মেল, হোয়াটস অ্যাপ গ্রুপ ও আমাদের ওয়েব সাইটে এই খেয়া পাওয়া যাবে। আশাকরি এই লকডাউন পরিস্থিতির মধ্যে সদস্যরা কিছুটা স্বস্তি পাবেন। প্রত্যেককে অনুরোধ, আপনারা খেয়ার জন্য লেখা পাঠান।

প্রত্যাবৃত্ত শিক্ষানবীশ সমাজ

দিলীপ কুমার সিংহ (৫৩)

শিরোনামটি কিছুটা খটোমটো শোনাতেও, হালফিলের লকডাউনের আলোচনা চত্বরে এসে যাচ্ছে। অবশ্য সাদামাটা কথাবার্তায়, বিভিন্ন বয়সের ভ্রমণে রত মানুষকে তা বুঝিয়ে দেয়। কোনোভাবেই এদের ভ্রমণবিলাসী আখ্যা দেওয়া যাবে না ; বরঞ্চ এরা চোখেমুখে প্রায় নাছোড়বান্দা স্থানত্যাগী বলেই প্রতীয়মান হবে। সেখানে একাকীত্ব যেমন বিরাজ করছে, তেমনি সংগ-বান্ধবা স্বতন্ত্রতায় মাত্রা পেয়েছে। কোনো অছিলায় নয় ; অসুস্থ এমনকি অন্তসত্ত্বা গৃহীণকে মাঝারি আয়তনের বসার জায়গাতে বসিয়ে, গৃহকর্তার অদম্য এগোনো, ক্লান্তি রুখবার নিমিত্তে স্কন্ধে শিশুকে বসানোর ভ্রাম্যমাণ-চিত্র, জনচক্ষুর দরবারে এসে গেছে। লকডাউনের বাহানায় বেতনভুকদের ওপর মালিকদের প্রকোপ ভারতীয় ঔদ্যককে ক্ষুণ্ণ করেই চলেছে। শ্রমালয় থেকে বেপ্রাপ্তি সূঠামতায় 'না' বলার দৃঢ়তা ও বলিষ্ঠতা উদ্ভূত হল ; পদব্রজে শামিল করল বহুসংখ্যক সহযোদ্ধাদের। কর্ণাটকের প্রমোটারবর্গের কাজে লাগানোর ঝড়িতি প্রস্তাব বলীয়ান জোটে অনুপ্রবেশে যে অসমর্থ হল, তার নজিরও তৈরী হল। অর্জিত নৈপুণ্যের ভান্ডার যে সদর্থকতায় উজ্জ্বলতা ও নিষ্ঠুরতা দেখাবে, তা কি পরবর্তী পর্যায়ের আর্থিক প্রস্তাবগুচ্ছ আচ করতে পারেনি ? নিম্পূহতার অথচ সাহসিকতার কাভারী, প্রত্যাবর্তনে সক্রিয় অনেক ব্যক্তিসকল ইতিহাসে জায়গা পেয়ে চলেছে, বীরত্বের নিষ্কলুষ মাহাত্ম্যে। অনেকেরই কারিগরি মূলধন হল নৈপুণ্যে এবং কর্মকুশলতার বৈচিত্র্যে। এই পুজির কলেবর ও ঔৎকর্ষ তথাকথিত শ্রমসম্পর্কিত রাজনীতির কক্ষপথে ধরা পড়বে না। গ্রামে-ফিরে-আসা-সমাজ আখ্যা দিলে খুবই কম বলা হয়। গান্ধীজী বেচে থাকলে হয়তো এদের বলতেন, "ওয়াপসি সমাজ", যারা ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছেন ভারতের নানা আঙিনায়। নয়া আর্থিকে তাদের ঈঙ্গিত বাসভূমির পূর্বে বাসিন্দারা/নেতৃবৃন্দ, কি এদের আহত সম্পদের ব্যবহারে প্রণোদিত হবেন না ? বাছাইয়ের সংকীর্ণতায় না পড়ে, জ্যোতিকুমারী, অনিরুদ্ধ মারে, মহম্মদ ইয়াকুব প্রমুখদের উদ্যোগী ভ্রমণ-বৃত্তান্ত স্মরণীয় হয়ে উঠছে। বৃহত্তরতায় ভরপুর ভ্রাম্যমাণ ব্যক্তিবর্গদের শিক্ষানবীশ হিসেবে গ্রহণ করতেই পারে, স্থানীয় বাসিন্দারা। বাগবাজারের শিক্ষা চত্বরে ভগিনী নিবেদিতার নৈপুণ্যের সদ্যবহারের কথা স্মরণে এসেই যায়।

(লেখটি অসম্পাদিত)

ঐতিহ্য

দেবপ্রসন্ন সিংহ (৬৭)

আমাদের স্কুলের ১০৬ বছরের ইতিহাসে কত কৃতি ছাত্রের নাম শুনেছি। সে তালিকা দীর্ঘ, তার প্রকাশ ও ঘটেছে স্কুল সংক্রান্ত বিবিধ পত্রিকায়। স্মৃতি চারণে অনেকের কাছে শুনি, সময়ে সময়ে, তাদের আরো কথা। সবাই কি স্কুলেই ধারাবাহিকভাবে বা শেষ পরীক্ষায় সাফল্য পেয়েছে? পরেও অনেকের, শিক্ষাক্ষেত্রে তো বটেই, আরো বহু দিকে বিচরণ, দক্ষতা। সেই কৃতি ছাত্রদের খতিয়ান ও কম নয়। আমরা গর্বিত হই সেই তথ্য জেনে, জানতে চাই আরো সংশ্লিষ্ট তথ্য, মেটাডাটা; আমাদের এক ধরনে উদ্বুদ্ধ করে সেই জীবনধারা। আজকের ইনটারনেটে ও বিবিধ দৃষ্টিকোণে তা বহুলাংশে বিদ্যুত।

এই বিভাগ সেই কথা, হয়তো বা কিছু পুনরাবৃত্তিতে, তা চাহিদার উত্তরে নব প্রয়োজনে নব প্রজন্ম কে জানান দিতে চায়। তার চুম্বকটুকু, তথ্য ভিত্তি ক খবরাখবরে, যতটা প্রথম ত তার সংখ্যা য়, পরে তার গুণেও।

এই সময়ে একটি বই মোবাইল গত হল। নাম : হৃদয় ভরে আলোর গানে। লেখক : সুনন্দ বোস (মাধ্যমিক ১৯৯১, উচ্চ মাধ্যমিক ১৯৯৩)। প্রকাশ : মে ২০২০। ১৮৮ পৃষ্ঠা র বই। স্কুলজীবনের ঘটনা, বেশিরভাগ টাই সহপাঠী, শিক্ষক, কিছুটা বিভিন্ন পরিবার, কিছুটা অন্যত্র পড়া। শেষে র কথায় প্রাক্তন ছাত্র হিসেবে দূরত্ব, বন্ধু শৈথিল্য র কথাও আসে। কুড়ি বছর বাদ জমায়েত, বিশেষ শিক্ষক সংবর্ধনা ছুয়ে যায় এইলেখা। এই লেখা র ভাষা সুস্বাদু। এই দীর্ঘ লেখা বিভিন্ন ভাবে ভাগ করে যে বর্ণনা তার তারিফ করতেই হয়। কতকগুলি রঙীন ছবিও দৃষ্টি টানে। কয়েকটি প্রাক্তন ছাত্রদের নাম গোড়ায় আসে। হয়তো এই বিভাগ খোলার যৌক্তিকতা সেইখানেই।

বালিগঞ্জ জগদ্বন্ধু ইনস্টিটিউশন স্থাপিত হওয়ার গোড়ার দিকে তো বটেই, পরের দিকেও, আর্থিক তহরুপে, কোটকাছারিতে, পরিচালনবর্গের দীর্ঘ অনুপস্থিতিতে অনেক রেকর্ডই পাওয়া যায় না। বহুদিন আগে থেকেই ইতিহাস লেখার সময় এটা ধরা পড়ে। অনেকেই তখন প্রয়াত, কিছু প্রকাশিত তথ্য, বেশ কিছু oral history-র উপর নির্ভর করে এই ইতিহাস খাড়া করা হয়। দাতা

জগদ্বন্ধু রায়ের বিশেষ Deed of Trustee বা অছি দলিল ১৪ নভেম্বর ১৯১৩ সহকৃত হয়ে তৈরি হয় এই স্কুল। তিনি সাতজন ট্রাস্টিকে নিযুক্ত করেন, যাদের উপর এই স্কুলের পরিচালনকার্য বর্তাবে। তাঁর ২০০০০ টাকা দান, ইচ্ছা, ভবন নির্মাণ নিয়ে কাজ শুরু হয়, কিন্তু তা বাধাপ্রাপ্ত হয়, অনেক নামীরা থাকা সত্ত্বেও। তখনকার ২ একডালিয়া রোডে এর যাত্রা শুরু, গোড়া থেকেই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের High English School হিসেবে এই স্কুলের অনুমোদন, ক্লাস থ্রি থেকে ক্লাস টেন পর্যন্ত সবক'টি অর্থাৎ আটটি ক্লাস নিয়ে। ১৯১৫ সালে প্রথম batch ছাত্র উত্তীর্ণ হয়। প্রথম প্রধান শিক্ষক ছিলেন বেচারাম নন্দী। গোড়া থেকেই ছিলেন আর একজন সহযোগী প্রফুল্ল কুমার সরকার, যিনি স্কুলের প্রথম দিন থেকে তাঁর জীবনের শেষ দিন ১৯৫০ সালের মে মাস পর্যন্ত ছিলেন। প্রথম সভাপতি ছিলেন সার আশুতোষ চৌধুরী। সহসভাপতি রায় বাহাদুর রামতারণ বন্দ্যোপাধ্যায়। যুগ্ম সম্পাদক পন্ডিত রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ (সম্পাদক ১৯১৬ - ১৯২২) ও অধ্যক্ষ মুরলীধর বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদক ১৯২২ - ১৯২৮)। ১৯১৯ সালে দশ জনকে চিহ্নিত করে নতুন ট্রাস্ট গঠন করা হয়। এ বিষয়ে আরো তথ্যমূলক ও আকর্ষণীয় কথা পরবর্তী সংখ্যাগুলিতে।

স্কুলে পড়েছেন এবং উত্তীর্ণ তার তালিকা দীর্ঘ, সব নেইও। তারই কয়েক জন শিক্ষাবিদদের নাম নিয়ে শুরু করি। বন্ধনীর মধ্যে তাদের স্কুল থেকে উত্তীর্ণ হবার সালটাও দেওয়া হল। কয়জন উপাচার্য ও সহ-উপাচার্য হয়েছেন? হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯২২) উপাচার্য, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়। পূর্ণেন্দু কুমার বসু (১৯৩২) সহ-উপাচার্য, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। দিলীপ কুমার সিংহ (১৯৫৩) সহ-উপাচার্য, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, উপাচার্য, বিশ্বভারতী। চিন্ময় গুহ (১৯৭৫) উপাচার্য, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়। হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন আই সিএস। অন্য তিনজন বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের যথাক্রমে রাশিবিজ্ঞান, গণিত ও ইংরেজী র প্রাক্তন অধ্যাপক, প্রধানও বটে। অন্যান্য অনেক পদে বৃত্তও ছিলেন। তাদের প্রকাশিত বিবিধ রচনা ও গ্রন্থের সংখ্যা একাধিক।

(চলবে)

Be our life member
online. No hassle.

Pay ₹500 and
fill in the form at :
<http://jagadbandhualumni.com/>

ONLINE MONEY TRANSFER:

JBI Alumni Association
Bank : Allahabad Bank ,
Golpark Branch
A/C No. 20789414709
IFSC Code : ALLA0210675
MICR CODE No. 700010026

কলকাতার পুরনো ক্লাবগুলো

স্বপন রায় চৌধুরী (৫৩)

প্রাচীন কলকাতার ফুটবল জগতে রাম ভট্টাচার্য (১৯৩৫-১৯৪৫) ছিলেন মোহনবাগানের দুর্দান্ত গোলকিপার। আদি বাড়ি বাগবাজার থেকে বালিগঞ্জে চলে এসেছিলেন। বালিগঞ্জ টেরেসে বাড়ি করে বসবাস শুরু করেন। বর্তমান টেরেসের নাম হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় সরণী। রামদা ছিলেন আমাদের ফুটবল খেলার গুরু, ট্রেনিং সেন্টার, টুর্নামেন্ট সর্ব ক্ষেত্রেই ছিলেন আমাদের কাণ্ডারী। খেলার মাঠের অনেক গল্প আমাদের করতেন, তথ্য দিতেন। আমি সেগুলো সংগ্রহ করতাম, যত্ন করে তুলে রাখতাম। কলকাতা প্রাচীন ফুটবল ইতিহাস রামদাই আমাদের চিনিয়েছিলেন। কলকাতার সেই হারানো ক্লাবগুলো নিয়ে আজ লিখলাম।

আড্ডার আসরে রামদা আসতেন, আমাদের শুধু খেলার গল্প করতেন। তাজহাট ও শোভাবাজারের নাম শুনেছি, আমি দেখিনি। টাউন ক্লাব, কুমারটুলি, মোহনবাগান, ভবানীপুর, এরিয়ান, স্পোর্টিং ইউনিয়ন, মহামেডান স্পোর্টিং, কালীঘাট, গ্রীয়ার, তালতলা, ই.বি.আর. ইস্টবেঙ্গল, পুলিশ, আমেনিয়ান প্রকৃতি ক্লাবগুলোকে আমি দেখেছি। তাছাড়া ছিল সাহেবদের ক্লাব ক্যালকাটা, ডালহৌসি ও রেঞ্জার্স।

টাউন ক্লাব বহু পুরনো ক্লাব। কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি, ব্যারিস্টার প্রভুটি এটি পরিচালনা করতেন। অ্যাটর্নি জেনারেল নীরেন দে একটি পরিচিত নাম। ভালো খেলোয়াড় ছিলেন। বিলেতে ইউনিভার্সিটির ফুটবল, ক্রিকেট এবং হকি টিমে নিয়মিত খেলতেন।

কুমারটুলি ক্লাব চালাতেন ভাগ্যকুলের রায়রা। পঙ্কজ রায়, প্রণব রায়ের (টেস্ট প্লেয়ার) বাবা, কাকারা কুমারটুলির কর্ণধার ছিলেন। এদের খেলোয়াড় গলব্রথ (গোলকিপার) ও তুলসী দত্ত, নামকরা খেলোয়াড় ছিলেন। কুমারটুলি ১৯২০ আই.এফ.এ. শীল্ড ফাইনালে রানার্সআপ হয়েছিল।

মোহনবাগান ক্লাব শ্যামপুকুরের - দ্বিজেন বসু, ভূপেন্দ্র বসুরা, আর শ্যাম স্কোয়ারের সেনেরা পরিচালনা করতেন। এদের মধ্যে কানাই সেন, দাঁতি সেন, কেষ্ট সেন, সুধাংশু বসু, সুধীর বসু, বাম্বিসি বসুকে দেখেছি। তাছাড়া ডি.এন.গুইন, মাতাল মিত্র, হাজরাবাবু, কানু দত্ত, গোষ্ঠাবাবু, কুমারবাবু, ধীরেন দে, শৈলেন মাস্তা অবধি দেখেছি।

এরিয়ান ক্লাবের প্রাণ ছিলেন শ্রদ্ধেয় দ্বীপ্যাম মজুমদার। প্রভাস মিত্র (বিচে বাবু) একাই সব কিছু করতেন। তাছাড়া ছিলেন প্রফুল্ল মুখার্জি, পুঁটে সেন, কালাধন মুখার্জি, পাটু মুখার্জি প্রভৃতি। পরে শত ঘোষ ও নন্টু মিত্র ক্লাব চালাতেন।

ভবানীপুর ক্লাবের একচ্ছত্র অধিপতি ছিলেন নানী মিত্র। এই ক্লাবে বড় খেলোয়াড় ছিলেন রবি দাস, শশী দাস, লাংচা মিত্র, মানা গুইন, ভাসি দাস প্রভৃতি।

স্পোর্টিং ইউনিয়ন ছিল মার্কাস স্কোয়ারের ক্লাব। এখানে খেলেছেন প্রো সারদারঞ্জন রায়, শৈলজা রায়, কার্তিক বোস, গণেশ বোস, বেরি সর্বাধিকারী, নিম্মলি ব্যানার্জি। পরিচালনায় ছিলেন পঙ্কজ গুপ্ত, বেচু দত্ত রায়।

মহামেডান স্পোর্টিং এর খেলোয়াড়রা ওয়াহেল মোল্লার একটা বাড়িতে একসঙ্গে থাকতো। বাসে করে একসঙ্গে প্র্যাকটিস করতে যেত। আবিদ আলি, ওমর প্রভৃতি ব্যবসায়ীরা পরিচালনা করতেন। এত ভাল টিম, এত প্রতিভার সমন্বয় খুব কমই দেখা গেছে। এদের খেলার রেকর্ডও অপূর্ণ।

কালীঘাট ক্লাব চালাতেন এ.কে. সেন। তাদের এম্পায়ার অফ ইন্ডিয়া এসিওরেন্স অসি ছিল ডালহৌসি স্কোয়ারে। এরাই বোধহয় একমাত্র ক্লাব যাদের তাঁবুতে বার ছিল। এ.কে. সেনের ছেলে খোকন সেন ইন্ডিয়ান হয়ে ক্রিকেট টেস্ট ম্যাচ খেলে, অস্ট্রেলিয়াতে ব্র্যাডম্যানকে স্টাম্প করেছিল।

গ্রীয়ার ও তালতলার তাঁবু ছিল প্রেসিডেন্সি কলেজের পিছনে। এরা দ্বিতীয় ডিভিসনে খেলত বলে আমি এদের কর্তৃপক্ষ কার্যকে চিনি না। তবে গ্রীয়ার ও তালতলার সঙ্গে খেলেছি যখন নেবুবাগান ক্লাবে খেলতাম। তালতলা ক্লাব বড় মারামারি করতো।

ই.বি. আর রেলওয়ে টিমে (ইস্টার্ন বেঙ্গল রেলওয়ে) সামাদ, মোনা দত্ত, বাঘা সোম, এস. নন্দী, পাখি সেন, কার্ভে, স্পীক, পি.কে. ব্যানার্জি প্রভৃতি বড় বড় খেলোয়াড় খেলতেন। পরিচালনা করতেন পি.এল. রায়, আনোয়ার, যামিনী মিত্র, পাঁচু চ্যাটার্জী। পি.এল. রায় ছিলেন পাকা সাহেব যিনি কলকাতায় বস্বিং শুরু করেন।

ইস্টবেঙ্গল তো মস্তবড় ক্লাব। জীতু মুখার্জিই প্রথমে চালাতেন। পরে প্রণব রায়, পঙ্কজ রায়দের বাড়ির কর্তারা এটিকে বড় করেন। মাঝে একজন ভট্টাচার্য এটাকে চালাতেন। এখন অনেক মেম্বার, অনেক স্পনসর।

পুলিশে অ্যাংলো ইন্ডিয়ান সার্জেন্টরাই খেলতো। বড় অফিসাররা এদের কর্তা ছিলেন। অনেক ভালো খেলোয়াড় ছিল। মিলস, পি.ডি. মেলো, স্টুয়ার্টস, উইদার্স প্রভৃতি।

আমেনিয়ানরা ছিল ট্যাস সাহেব। এদের আলপিন বড় খেলোয়াড় ছিল। এরা এন্টালি, নোনাপুকুর এসব জায়গায় থাকতো।

ক্যালকাটা ক্লাবে বিলেতের সাহেব যারা এখানে থাকতো, তারাই খেলতো আর পরিচালনা করতো। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী জেনারেল ম্যানেজার মারে রবার্টসন ক্লাবের কর্তা ছিলেন। আর ছিল হৌসি, ল্যাগডেন, নাইট। নাইট একজন মস্ত বড় খেলোয়াড় ছিলেন।

ডালহৌসির সকলেই প্রায় জুট মিল অফিসার। তারাই ক্লাব চালাতো। তাঁদের হাউই, হোসী, বেল, কুক, স্টাথা, পাঁচজন ভালো ভালো ফরওয়ার্ড ছিলো। হাফে দুজন ব্রাউটন খেলতো। ব্যাকে বেনেট ও কলভিন। গোলে ডেভিস। ডেভিস খুব ভালো গোলকিপার ছিলো।

রেঞ্জার্স কলকাতায় অ্যাংলো ইন্ডিয়ানদের টিম। এই দলে তিনজন লামসডেন খেলতো। সেন্টার ফরোয়ার্ড, সেন্টার হাফ, গোলকিপার। তারা তিন ভাই লামসডেন ব্রাদার্স।

কলকাতার পুরানো ফুটবল ইতিহাস একটু জানা দরকার। পুরানো ডায়েরি খেঁটে রাম ভট্টাচার্যের দেওয়া অনেক তথ্য ক্রীড়াপ্রেমী মানুষের কাছে তুলে ধরার চেষ্টা করলাম।

ফটোগ্রাফি

মেগাপিক্সেল যুদ্ধ—একটি ভুল ধারণা (megapixel myth)

দেবদীপ দে (৮৫)

“তোর ফোন কত মেগাপিক্সেল?”

“দ্যাখ এই ফোনে ৬৪ মেগাপিক্সেল দিয়েছে, দাম তো একটু বেশি হবেই!”

“হ্যাঁরে তোর ক্যামেরা কত মেগাপিক্সেল, কী ভাল ছবি এসেছে?”
— কথাগুলো চেনা চেনা লাগছে?

হ্যাঁ, মুঠোফোন (Smartphone/mobile) আসার পর থেকে ক্যামেরা আমাদের পকেটবন্দি। আর আমাদের আবেগ উৎসাহের সাথে সাথে বাড়ছে ফোন কোম্পানির বিভিন্ন মার্কেটিং গিমিক। “মেগাপিক্সেল” তার মধ্যে অন্যতম।

তোমরা সবাই জানো যে ছবি হল “আলো আর আঁধার” (light and dark)-এর খেলা। যে ক্যামেরা যত বেশি আলো আর আঁধার ধরে ছবি তৈরি করতে পারবে সেটা তত মনোগ্রাহী হবে, দৃষ্টিনন্দন হবে। এই আলোকে ধরার প্রধান উপকরণ হল “সেন্সর” (sensor)। আর এই সেন্সর-এর উপর থাকে আলো উত্তেজক কণা (photo sensitive cell), যাকে বলে পিক্সেল (pixel)। আলো সেন্সর-এর উপর পড়লে পিক্সেল উত্তেজিত হয়ে ডিজিটাল সিগনাল (digital signal) তৈরি করে ছবির জন্ম দেয়। বিষয়টা বেশ একটু জটিল আর সেটা আজকের আলোচনার বিষয় নয়।



সেন্সর-এর উপর যত বেশি পিক্সেল থাকবে তত বেশি আলো ধরতে পারবে আর তত ভাল ছবি হবে – এটাই স্বাভাবিক। আর এখানেই সেই আসল গোলমাল বা ধোঁকাবাজি (fallacy)। যে কথাটা কেউ বলে না বা মাথায় রাখে না সেটা হল এক একটা পিক্সেল কত বড়। যত বড় পিক্সেল তত বেশি আলো তত ভাল ছবি। পিক্সেল-এর আয়তন কমলে আলো ধরবে কম, আর তাই ছবি তত জমবে না। তাই পিক্সেল-এর সংখ্যা আর আয়তন দুটোই সমান গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু পিক্সেলগুলো যে পাশে থাকে সেই সেন্সর বোর্ড-এর আয়তন তো আর ইচ্ছামতো বাড়ান যায় না, তাহলে ফোন না ধরবে পকেটে (size), না মিলবে আমাদের পকেটের ওজনের সাথে (price)। তাই বাড়াও পিক্সেল যত খুশি – ৩২, ৪৮, ৬৪ মেগাপিক্সেল। কিন্তু সেন্সর সমান মাপের, মানে পিক্সেল ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র (নীচের ছবির মতন)। যার অর্থ – ছবির মান আর বাড়ল না, বাড়ল কিছু সংখ্যা – পিক্সেল আর ফোনের মূল্য।

তাই শুধু পিক্সেল সংখ্যা নয় সেন্সর বোর্ডের আয়তনও সমান গুরুত্বপূর্ণ আর ফোন কেনার সময় এই দুটো কথাই মাথায় রাখা খুব দরকার।

পুনশ্চঃ সেন্সর বোর্ডের আয়তন আর প্রকারভেদ নিয়ে অন্য একদিন কথা হবে।

সদৃশ

পার্থপ্রতিম সেনশর্মা (৬৯)

টিক টিক টিক টিক সময় বহিয়া যায়,

অরুণের আভা পড়ে অরুণ লুকায়।

টিপ টিপ টিপ টিপ বরিষন ধারা,

ব্যকুল উদাসী মনে অশ্রু বাঁধন হারা।

ঢং ঢং ঢং ঢং শুনি ঘন্টার ধ্বনি,

উষার লগনে উঠে প্রভাতের আগমনী।

বন বন বন বন বিশ্বের ঘূর্ণন,

মৃত্যুর মাঝে হেরি জীবনের স্পন্দন।

শন শন শন শন রবে বিজন বহিছে ধীরে,

শীতল করিছে আসি এ মোর তাপিত শিরে।

ধুক ধুক ধুক ধুক অধীরে কাঁপিছে বুক,

নলিনী শরমে লাগি সলিলে লুকায় মুখ।

ছপ ছপ ছপ ছপ রবে তরণী ছুটিয়া যায়,

কপোল ললিতে রাঙে হাসির ছটায়।

হর হর হর হর বেগে ধাইছে প্রলয় বাণ,

পাদপের ছায়া পড়ে বিহঙ্গে গাহিছে গান।

কুলু কুলু কুলু কুলু স্বরে ততিনী সাগর ' পরে,

হাসিয়া মিলিছে তাহে সুমধুর প্রণয় ভরে।

ফিক ফিক ফিক ফিক হাসে অমলিন বালিকা,

সুরভি নিশ্বাস যেথা ফেলে ফুল কলিকা।

হাই তোলা কি দোষের?

সঞ্জয় ব্যানার্জী (৮৪)

ভারতের সঙ্গে খেলা চলার সময় পাকিস্তানের অধিনায়ক সরফরাজ আহমেদের হাই তোলার ঘটনা নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ প্রচুর হয়েছে। ঘটনার এক সপ্তাহ পর সরফরাজ, একটি সাক্ষাৎকারে বলেন, “হাই তুলেছি। কোনও অপরাধ তো করিনি! এটা অত্যন্ত সাধারণ একটা ব্যাপার। যেটাকে ফলাও করে দেখানো হচ্ছে।” সরফরাজ ঠিকই বলেছেন। হাই তোলা অত্যন্ত সাধারণ একটা ব্যাপার। তাহলে এখন প্রশ্ন, “আমরা হাই কেন তুলি?” এই উত্তরটা জানার পর হাই তোলা নিয়ে আপনার ধারণাটাই বদলে যাবে।



হাই ওঠা মানে ঘুম পাওয়া নয়

প্রাচীনকাল থেকে একথা আমাদের বিশ্বাস করে আসছে যে হাই ওঠা মানেই ঘুমানোর সিগন্যাল দিচ্ছে শরীর। কিন্তু এই ধারণা একেবারেই সঠিক নয়। কারণ চিকিৎসা বিজ্ঞান বলছে যখন আমরা হাই তুলি তখন মস্তিষ্ক একবার রিস্টার্ট করে নেয় নিজের সার্বিক প্রক্রিয়াকে। ফলে ব্রেনের কাজ করার ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। হাই তোলার পর মস্তিষ্ক এতটাই কর্মক্ষম হয়ে যায় যে দ্বিগুণ কাজ করার ক্ষমতা চলে আসে।

আমরা হাই তুলি কেন?

যখনই আমরা হাই তুলি তখন বিপুল পরিমাণ অক্সিজেন আমাদের মুখের মধ্যে দিয়ে প্রবেশ করে ইয়ারড্রামসকে প্রসারিত করে। তারপর হাওয়াটা বেরিয়ে যায়। প্রসঙ্গত, কিছু কিছু সময় কাউকে হাই তুলতে দেখে রিফ্লেক্সে আমাদেরও হাই উঠে যায়। তবে বেশিরভাগ সময়ই শরীর তার প্রয়োজন অনুসারে বিষয়টিকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।

হাই তোলার উপকারিতা

খুব মন দিয়ে কাজ করার সময় মাঝে মাঝে আমাদের হাই উঠতে শুরু করে। মন দিয়ে কাজ করলেও মস্তিষ্ক অল্পতেই হাঁপিয়ে যায়। তখন সে কাজ ছেড়ে এদিক ওদিকের ভাবনাকে গুরুত্ব দিতে শুরু করে। সেই সময় মস্তিষ্কে পুনরায় মূল কাজে ফিরিয়ে আনতে শরীর একবার ব্রেনকে রিস্টার্ট করে। আর তখনই আমাদের হাই ওঠে।

- আমাদের স্মৃতিশক্তি উন্নতিতেও হাইয়ের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। তাই এবার থেকে কাজ করতে গিয়ে যখনই ক্লান্ত লাগবে তখনই নিজের থেকে কয়েকবার হাই তোলার চেষ্টা করবেন। এমনটা করলেই দেখবেন মনোযোগ ফিরে আসবে।
- আমরা যখন হাই তুলি, তখন ফুসফুসে অনেকটা অক্সিজেন প্রবেশ করে আর ফুসফুস থেকে কার্বন ডাই অক্সাইড দ্রুত বেরিয়ে যায়। ফলে মস্তিষ্কে অক্সিজেনের পরিমাণ এক ধাক্কায় অনেকটাই বেড়ে যায়।
- গবেষণা করে দেখা গিয়েছে যে, হাই তুললে মস্তিষ্কের উত্তেজনা প্রশমিত হয়। হাই তোলার ফলে মস্তিষ্ক শিথিল হওয়ার পাশাপাশি মানসিক দক্ষতাও বৃদ্ধি পায়। হাই তোলা মায়ু তন্ত্রের উদ্দীপক হিসেবে কাজ করে।
- বিজ্ঞান বলে হাই ওঠার সময় আমাদের মস্তিষ্কে ডোপামাইন লেভেল বেড়ে যায়। ফলে অক্সিটোসিন নামে এক ধরনের কেমিকেলের ক্ষরণ বেড়ে গিয়ে আমাদের মন-মেজাজ একেবারে চাপা হয়ে ওঠে।
- হাই তোলার ফলে মুখের ও বুকের মাংসপেশি অনেকটা প্রসারিত হয়। হাই তুললে দীর্ঘক্ষণের শরীরিক জড়তা বা আড়ঠতা মুহূর্তের মধ্যে উধাও হয়ে যায়।
- গবেষকদের দাবি, হাই আমাদের শরীর আর মস্তিষ্কের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করে। গ্রীষ্মকালে আমাদের শরীরের তাপমাত্রা শীতকালের তুলনায় অনেকটাই বেড়ে যায়। তাই গ্রীষ্মকালে শীতকালের তুলনায় অনেক বেশি হাই ওঠে।

হাই কিন্তু বেজায় ছোঁয়াছে

অনেক সময় কাউকে হাই তুলতে দেখলে পরক্ষণেই আমাদেরও হাই উঠতে শুরু করে দেয়। কাউকে হাই তুলতে দেখলেই আমাদের মস্তিষ্কে মিরার নিউরন কাজ করতে শুরু করে দেয়। অর্থাৎ আমার সামনের লোকটা যা করছে ঠিক হুবহু তাই করতে ইচ্ছা করে। সেই কারণেই তো একজনের হাই উঠলে সামনে থাকা বাকি সবাই একে একে হাই তুলতে শুরু করেন।

একটানা হাই উঠলে কি করবেন?

কাজের মাঝে ঘন ঘন হাই উঠছে, থামাতে পারছেন না, অনেকসময় খুব বিরক্ত ও অন্যদের মাঝে বিরত লাগে। সেটা কমানোর জন্য, জায়গা ছেড়ে উঠে হাঁটাহাঁটি করুন, লম্বা করে শ্বাস নিন, জল বেশি করে খান, আর আশেপাশে কাউকে হাই তুলতে দেখলে তার কাছ থেকে সরে যান।

রম্য অনুগল্প

কচুর লতি খাবার অপরাধে

সন্দীপ চট্টোপাধ্যায় (৮৫)

ভজন গোস্বামীকে ঠিক পেটুক বলা যায় না। তবে ওপার বাংলার তখনকার দিনের মানুষ তো, নোন্নার ধারাটা অন্যরকম। সেই ধার আর ধারা যখন জেনেছিলেন পাড়ার শিখাবৌদি, তখন বুঝলেন তার রান্নার প্রকৃত সমঝদার তিনি পেয়ে গিয়েছেন। শিখাবৌদিও তালেগোলে বাঙাল। রান্না তার শিরায় ধমনীতে। ভজনবাবুর বউ নমিতা শিখাকে বারণ করলেও শোনেটা কে? আজ ‘আম-ডাল’ তো কাল ‘জাম-আলু ভর্তা’, সামান্য সজনে ডাঁটার চচ্চড়ি করলেও ভজনবাবু তার ভাগ পান। শিখার হাতের তরিতে সে সব পদ ভজনবাবুর রসনায় যেন অমৃতসম বোধ হয়।

যখন এমন শিল্পময় রন্ধনচর্চা, রসনাপ্রীতি আর ভোজন-পরবর্তী উদগারবিলাস চলছে - তখন কখন যে পৃথিবীতে ভাইরাসের বিষবাপ্প বইতে শুরু করেছে।

লকডাউনের বাজারেই মুখে মাস্ক পরে বেল দেয় শিখা। নমিতা নেমে আসে দরজা খুলতে, এখন এসব কেন?

- না, দাদার জন্য মনটা যেন কেমন করে ... আজ কচুর লতি-চিংড়ি করেছে ... ভাবলাম আমার হাতে তো এ পদ ভজনদা কখনো খাননি।

নমিতা কিন্তু কিন্তু করতে করতে কচুর লতি-চিংড়ির বাটি নিয়েই ফেলেন। ওপর থেকে পদের নাম শুনেই ছোট তালি মেরে ভজন

গোস্বামী লাফিয়ে ওঠেন। ভোজনের মুখরাতেই মজে যান ভজন - এমন রাঁধতে পারে কজন? নমিতাকে বলে, দেখো, রান্না করে কয় - তোমরা ঘটিগুলান ত কিসুই শিখলা না ...

দুদিন পর কচুর লতির স্বাদ তখনও ভুলতে পারেননি, ভোরবেলার স্বপ্নেও শিখার হাতের কচুর লতি। সাতসকালে ডোরবেল। ঘুমজড়ানো চোখে বারান্দা থেকে উঁকি দিয়ে ভজন ঘাবড়ে যান - এরা কারা? মুখে মাস্ক, শাড়ির ওপর সাদা অ্যাপ্রন। তারাই জানায় - তারা পুরসভা থেকে আসছে স্বাস্থ্যকর্মী। ভজন গোস্বামীকে চান তারা। বলে কী, কেন ...?

শিখা সামন্তের রান্না করা কচুর লতি খাবার অপরাধে ভজনবাবুর ১৪দিনের হোম কোয়ারেন্টাইন হয়ে গেল। কচুর লতি এনেছিল শিখার কাজের লোক, তার ছেলের করোনা ধরা পড়েছে।

‘আরে বাবা, কত ডিগ্রি টেম্পারেচারে কচুর লতি রান্না হয়েছে জানো ... কখনও থাকতে পারে করোনার পিন্ডি’ - কিন্তু ভজনের কথা কে শোনে। নমিতা অবধি আলাদা ঘরে থাকেন। ছেলে, ছেলের বউ কান পেতে শোনে - বাবার ঘর থেকে খুক করে কাশি হলেও হেল্লাইনে ফোন করতে হবে যে। একা শুয়ে ভজনের কান্না পায় -- সবে দুদিন কাটিয়েছেন এখন চব্বিশ ঘন্টার আরো বারোটা দিন -

কচুর লতি খেয়ে গলা কুটোনের দুঃস্বপ্ন দেখেন রাতে।

সমস্ত পৃথিবীর আজ গভীর অসুখ।
করোনাভাইরাস আমাদের জীবনেও থাবা বসিয়েছে।

আমাদের প্রাভুতীদের মধ্যে আমরা হারিয়েছি

১৯৮৬ সালের প্রাভুতী

গোবিন্দ পালকে।

তাঁর অকালপ্রয়াণে আমরা অত্যন্ত শোকাহত।

তাঁর পরিবারের প্রতি রইল আমাদের সমবেদনা।

- বালিগঞ্জ জগদম্বু ইনসটিটিউশন অ্যালমনি অ্যাসোসিয়েশন

করোনা, লকডাউন এবং আমফান দুর্যোগ বিধ্বস্ত পরিস্থিতিতে
গরিব নিম্নবিত্ত মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন আমাদের অগণিত প্রাভুতী।

ত্রিলোকেশ কুণ্ডুর নেতৃত্বে ঢাকুরিয়া অত্রি সোসাইটি,

কৌশিক চ্যাটার্জি ও স্কাউটের সহযোগিতা,

ইন্দ্রনীল সরকার, সৌভিক ঘোষাল, পলাশ পাল, সুমিত সেনগুপ্ত,

স্বপন রায় চৌধুরী, প্রবীর নাগ, বৈশ্বানর চট্টোপাধ্যায় সহ

যাঁরা যাঁরা এই যুদ্ধে মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন

এবং

সুধীরঞ্জন সেনগুপ্ত, অমিতাভ বিশ্বাস,

অরুণ নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও ৮১ব্যাচের বহু প্রাভুতী,

রাজপ্রতিম চক্রবর্তী প্রমুখ যাঁরা আর্থিক সাহায্যদানের

মাধ্যমে আমাদের প্রাভুতীদের একাজে সহযোগিতা করেছেন

সবাইকে অ্যালমনির তরফ থেকে অভিনন্দন জানাই।



**মহেন্দ্র লাল
দত্ত®**
mld®
MOHENDRA LAL DUTT
A TRADITION OF TRUST
SINCE 1882

**47/3B, GARIAHAT ROAD,
KOLKATA - 700 019**
Phone: 033 24631168
(M) 9830174960 / 9903731550
website: www.mldumbrella.com

Rotary  **BE THE INSPIRATION**

ROTARY CLUB OF KASBA




PP Rtn. Subhasish Bose - 9830209051
Website : www.rotaryclubkasba.com

যার খাবার খেলেই মন ভালো হস্তুে যায়



গুণ ক্যাটারার

৪২/৪৩ ইষ্টে প্রভু পার্ক, কলকাতা - ৩৯
০৩৩ ২৩৪৩ ৯৬৮৮
৯৮৩১০০১১০৯ / ৭০০৩৬৬৮৯৬৩



জ্যোতিভূষণ চাকী ছাত্রবন্ধু প্রকল্পে
অন্তত ১টি স্কুল পড়ুয়ার
(আর্থিকভাবে পিছিয়ে-পড়া পরিবারের)
সারা বছরের পড়াশুনার
খরচের দায়িত্ব নিন। - ৭৫০০ টাকা
আমরা তাদের হাতে তুলে দেব।

যোগাযোগ -
সঞ্জয় ব্যানার্জি ৯৮৩১৫ ৯০৩১৩
কৌশিক চ্যাটার্জি ৮৯৬১৭৩০৩০২

বিনীত-
সুধীরঞ্জন সেনগুপ্ত '৬৬
(একজন শুভচিন্তক)

Printer & Publisher: **SANDIP CHATTERJEE** (M.: 8981752100)
On behalf of **BALLYGUNGE JAGADBANDHU INSTITUTION ALUMNI ASSOCIATION**
Printed at 189F/2, Kasba Road, Kolkata - 700 042
Published from: Print Gallery, 25, Fern Road, Kolkata - 700 019
Editor's Name: **SANTANU CHATTERJEE**